অসুখটা ছড়াবে না

মানিক দাস

এক

শরাইঘাট এক্সপ্রেস সাধারণত ছাড়তে দেরি করে না। সাতটার ট্রেন ঠিক সাতটাতেই ছাড়ে। আজ বেশ দেরি করল ছাড়তে। প্রায় দুঃঘন্টা। অস্বাভাবিক দেরি। যাত্রীরা সবাই বিরক্ত। অনেকের মধ্যে ক্লান্তি। অলক জানালা দিয়ে লালজামা পরা এক কুলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যা হুয়া ভাই?' সে উদাসভাবে বলল, 'মালুম নেহি।' সমরেন্দ্র আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল। তার মুখ থেকে জানা গেল, আলফা সামনে কোথাও নাকি শরাইঘাট এক্সপ্রেস উড়িয়ে দেবার জন্য রেললাইনের ওপর বোমা পেতে রেখেছে। খবর পেয়ে পুলিশ তল্লাসি চালিয়ে বোমা উদ্ধারের চেষ্টা করছে। পুলিশ কোথাও কিছু পায়নি যদিও, সে জন্যই দেরি।

'যও সব', ইমরান বলল। ওর গলায় বিরক্তি ও রাগ। কাল বোলপুর পৌঁছোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, একটা ক্লাস মিস করা ছাড়া উপায় নেই। ইমরাণ অসমিয়া ছেলে, খুব ভালো বাংলা বলে। ওর সহপাঠী অলক আর সমরেন্দ্র বাঙালি। এরা সবাই অসমের ছেলে। ছুটি কাটিয়ে একসঙ্গে কলাভবনে ফিরছে। আগেই ফেরার কথা, রিজার্ভেশন পায়নি বলে দেরি করে ফিরছে। তিনজনের মধ্যে ইমরান বেশি সিরিয়াস। স্বভাবতই, ক্লাস মিস করতে হবে ভেবে সে একটু মনমরা হয়ে পড়েছে।

ঠিক নটা পাঁচে ট্রেনটা গুয়াহাটি স্টেশন ছাড়ল। সিটি বাজার সঙ্গে সঙ্গে কামরার ভেতরে এবং বাইরে হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। কেউ প্ল্যাটফর্মে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, ট্রেন ছাড়া মাত্র লাফ দিয়ে ট্রেনে চড়ল। কেউ বা কাউকে তুলে দিতে এসে বিদায় ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত কামরা থেকে নেমে যাচ্ছে। কেউ হুমড়ি খেয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, হাত নাড়ছে। এই অবস্থায় একজন মাঝবয়সি লোক হন্তদন্ত হয়ে ইমরানদের কামরায় উঠলেন। বেশ শক্তপোক্ত মোটাসোটা শরীর, খুব একটা লম্বা নন, কিন্তু খাটোও বলা যাবে না। ধবধবে সাদা ধুতি - পাঞ্জাবি পরা। সঙ্গে লাগেজ বলতে একটা বড়োসড়ো স্কাইব্যাগ। দেখলেই বোঝা যায় বেশ সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন লোক। সিটের নম্বর দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর ভদ্রলোক তাঁর হাতের স্যুটকেসটা নীচে জায়গা নেই দেখে ওপরের বার্থেই তুলে রাখলেন। ট্রেন ততক্ষণে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কামরার যাত্রীরা মোটামুটি থিতু হয়ে বসেছে।

ভদ্রলোক ঘামছেন। ঘামার কথা নয়, গরম পড়েছে যদিও খুব একটা নয়। বরং রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু শীত শীত ভাব করে। বেশ লাগে। এদিকটা আবহাওয়া এরকমই। ভদ্রলোককে ঘামতে দেখে সমরেন্দ্রর মায়া হল, বলল, 'আপনি ঘামছেন, জানালার ধারে এসে বসুন, হাওয়া পাবেন।' বলে ও জানালার ধার থেকে সরে গেল। ভদ্রলোক কিছু না - বলে সেখানে গিয়ে বসলেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

'তাড়াহুড়োয় জলের বোতলটা ফেলে এসেছি, একটু জল খাওয়াবেন ভাই?' তিনি সমরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন।

'ওহ সিয়োর' বলে ও ঝোলানো সাইড ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। তিনি 'ধন্যবাদ' বলে ওর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বোতল ফেরত দিতে দিতে বললেন, 'বড়ো তৃপ্তি পেলাম। তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

'বোলপুর।'

'কাজে না ঘুরতে?'

'পড়তে'।

'পড়তে? কী পড়তে?'

'আর্ট।'

'তিনজনই?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো।'

ভদ্রলোক জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। আলো অন্ধকারে শুধু ঘরবাড়ি গাছপালা আর লোকজনের গতিময়তা। তিনি বোধহয় কিছু ভাবছেন। ইমরানদের সেরকমই মনে হল। কামরার এই অংশটাতে আটজন যাত্রী থাকার কথা, আছে মাত্র চারজন। তিনবন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করে দু-চার কথা বলল। ভদ্রলোক তা শুনে বাইরে থেকে চোখ না - সরিয়ে, আপনমনে, বললেন, 'ফাঁকা যাবে না। লোক উঠবে, মনে হচ্ছে কামাখ্যা স্টেশনেই দু-চারজন উঠবে।'

ওরা কোনো মন্তব্য করল না, কামাখ্যা স্টেশন। খুব কম সময়ের জন্য থামল যদিও বেশ কিছু লোক তার মধ্যেই হইচই চেঁচামেচি করতে করতে কামরায় উঠে এল। চেহারা, পোশাক আর ধরনধারণ দেখে বোঝা গেল অধিকাংশই বাঙালি। দু-চারজন অসমিয়া। অসমিয়ারা চুপচাপ নিজেদের রিজার্ভ করা সিট খুঁজছে। বাঙালিরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনর্গল বকবক করতে করতে অন্যদের ঠেলে - গুঁতিয়ে সিট নম্বর দেখতে লাগল। ফাঁকা পড়ে থাকা সিটগুলোতে কে আসে দেখার জন্য ইমরানরা কৌতূহলী হয়ে সদ্য - ওঠা যাত্রীদের দিকে চেয়ে আছে। মনে মনে ভাবছে, বাঙালি কেউ না-এলেই ভালো। একটু অপেক্ষা করার পর দেখা গেল একটি অসমিয়া পরিবারের চারজন সদস্য সেই ফাঁকা বার্থগুলো অধিকার করে নিয়েছে। স্বস্তি। তিনজনই এ-ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করল। স্বামী - স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে। ছেলেটি বছর পনেরোর আর মেয়েটি বছর দশেকের। দেখে মনে হল বেশ ভদ্র, শান্ত এবং মার্জিত।

ট্রেন ছাড়ল।

অসমিয়া পরিবারটি নিঃশব্দে চারটে বার্থে নিজেদের বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। বুঝতে অসুবিধে হল না যে, এরা ট্রেনে চড়তে এবং গুছিয়ে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত। বিশুবাবুর বার্থ ওপরে। তিনি হঠাৎ 'আমি শুয়ে পড়ি, তোমরা কথা বল' বলে তাঁর বার্থে উঠে গেলেন। স্যুটকেসটা নামালেন না। সেটাকে শিয়রে রেখেই কাঁচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ মেলা, ঘুম নেই চোখে। আসলে তাঁর শরীরটা ভালো লাগছে না। একটু বিশ্রাম দরকার, দরকার একটু শোয়া। তাই শয্যাশায়ী হয়েছেন।

ভদ্রলোকের নাম বিশ্বনাথ কর্মকার। বিশুবাবু। বাড়ি গুয়াহাটিতে। বড়ো ব্যবসায়ী, অনেক টাকার মালিক। তিন জায়গায় বাড়ি করেছেন। বিরাটি, নগাঁও আর গুয়াহাটিতে। সংসারের কিছু ভাগ্যবান থাকেন যাঁরা যেটাতে হাত দেন সেটাতেই সোনা ফলে। বিশুবাবু সেই দলের মানুষ। জীবনে অনেক কষ্ট, অনেক ঘাত - প্রতিঘাত সহ্য করেছেন। দুঃখ - কষ্ট কী জিনিস তা তিনি ভালোভাবে জানেন। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর নিজেকে ব্যবসায়ী হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছেন। পরীক্ষামূলকভাবে অনেক রকমের কাজে হাত দিয়ে দেখেছেন। সব কাজেই সফল হয়েছেন। অনেক টাকা তাঁর, কিন্তু কোথায় কত টাকা রেখেছেন তার হদিস অন্য কেউ জানে না। কিন্তু সবাই বুঝতে পারে যে তাঁর টাকা আছে।

তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে বড়ো, কলেজে পড়ার সময় একটি মুসলমান মেয়ের খপ্পরে পড়ে ধর্মান্তরিত হয়। তরপর মেয়েটিকে বিয়ে করে দিল্লি চলে গেছে। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, সে চলে যাচ্ছে, তাকে যেন কেউ মনে না রাখে। তার নিজেরও দাবি - দাওয়া নেই। কিছু চায়নি, চাইবেও না। চাইলেও বিশুবাবু দিতে যাবেন কোন দুঃখে? আক্ষরিক অর্থেই সে এখন ত্যজ্যপুত্র।

মেয়েটি এম এ পাস করেছে। ইংরেজিতে। একটি কলেজে পার্ট টাইমের কাজ পেয়েছে। এখন স্থায়ী একটি ভালো চাকরির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদিও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তিনি মেয়ের বিয়ের কথা ভেবেছেন, মেয়ের সম্মতি নিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেকগুলো প্রস্তাব এসেছিল। তিনি একটিকে পছন্দ করেছেন। কলকাতার ছেলে। এম বি এ পাশ। রিলায়েন্সে চাকরি করে। যোগাযোগ করার পর ছেলেপক্ষ এসে দেখে গেছে, প্রাথমিকভাবে পছন্দও হয়েছে। বিশুবাবু এখন কলকাতা যাচ্ছেন সেই ছেলের বাড়িঘর দেখতে। যদি সব ঠিক থাকে তা হলে এখানেই পাকা কথা বলে আসবেন।

বিশুবাবুর মনটা বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই খুব খারাপ। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। হবেই। সবাই দেয়। কিন্তু তারপর? তারপর তো তিনি একা হয়ে পড়বেন। স্ত্রী চিররুগ্না। প্রায়শ শয্যাশায়ী থাকেন। এই বিশাল ব্যবসা সামলানোর ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীকেও সামলাতে হয়। আগে মেয়ে ছিল পাশে, এখন তো একা হাতে নিজেকেই সামলাতে হবে। সেই চিন্তা তো আছেই, তারপর আছে সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা। এই বিশাল সম্পত্তির কী হবে? তিনি আগলে বসে থাকবেন? জামাইকে দিয়ে দেবেন? জামাই কি দায়িত্ব নেবে? পারবে সামলোতে? সে যদি ডুবিয়ে দেয়? সব সম্পত্তি মেয়েই পাবে। মেয়ে পাওয়া মানে তো জামাইয়ের পাওয়া। জামাই যদি সব নয়ছয় করে? এই চিন্তাটা মাথায় ভার করে বসেছে। কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না। কিছু করতেও ইচ্ছে করছে না। অবসাদ বোধ হচ্ছে। মেয়ে বিয়ে দেওয়া মানে সব শেষ। সাধে কি লোকে ছেলে ছেলে করে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখে তন্দ্রা মতো এসেছিল। হটাৎ তাঁর কানে গেল মৃত্যু আর পরজন্মের কথা। কারা যেন এই নিয়ে কথা বলছে। তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। কান খাড়া করলেন। জানালার ধারে যে দিকটায় দুটো বার্থ আছে সেদিকে দু-বন্ধু মুখোমুখি বসে গল্প করছে। তৃতীয় জন ওপরে শুয়ে আছে। সে হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

'এটা ঠিক, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না।'

'আমার তা মনে হয় না। মনে হয় কিছু একটা আছে। তা ছাড়া কথাটা ভাবতেও তো খারাপ লাগে।'

'কেন, খারাপ লাগার কী আছে?'

'খারাপ লাগবে না? এইখানে এতদিন আছি, এত কিছু করছি, কত মায়া - মমতা, কত সুখ - দুঃখ এসব সব ছেড়ে একদিন চলে যাব, আর আসব না, কথাটা ভাবতেই তো বুকটা কেমন করে ওঠে। করে না বল।'

'সে তো ঠিকই, তবু যেতে হবে, এটাই সত্য।'

বিশুবাবুর বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। তিনি নেমে এসে ওদের সঙ্গে এ-নিয়ে একটু কথা বলবেন ভাবলেন। কিন্তু এই রাত্রিবেলা (রাত যদিও খুব একটা হয়নি!) নেমে গিয়ে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়া যাত্রীদের বিরক্ত করতে চান না। তা ছাড়া বসবেন কোথায়? নীচের বার্থে লোক শুয়ে আছে, সিট তো নেই - ই, ফাঁকা জায়গাও নেই যে বসে দু-কথা বলবেন। তিনি তাই শুয়ে শুয়েই ওদের কথা শুনতে লাগলেন।

'সব দেশে সব মানুষের মনে এই ব্যাপারটা কাজ করে। চিরকাল মানুষ ভেবেছে, মৃত্যুর পর কী আছে? প্রত্যেক ধর্মে কিছু না কিছু বলা হয়েছে। স্বর্গের কথা, মর্ত্যের কথা, পাপ-পুণ্যের কথা এসব সমস্তই এসেছে এই ভাবনা থেকে। ধর্মপ্রচারক ছাড়া আরও অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাফ সাফ অনেকে বলেছেন, এখানেই সব শেষ, মারা যাবার পর আর কিছু থাকে না। আবার অন্য অনেকে বলেছেন যে না, আছে, তারপরও জীবন আছে। বিচিত্র তাদের যুক্তিজাল। থই পাওয়া যায় না।'

'তুই এত কথা জানলি কী করে?'

'আমাদের কুলগুরুর কাছ থেকে। তিনি বেশ পণ্ডিত লোক, তাঁর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি। তিনি বৌদ্ধ, জৈন থেকে শুরু করে আর যেসমস্ত ধর্ম আছে সব ধর্মের বিশ্বাসগুলো গুলে খেয়েছেন, জলের মতো তরল করে সব বলে যেতে পারেন। কোথাও আটকায় না। আটকালে বলেন, পরে জেনে নিয়ে জানাব। পরে সত্যি সত্যি ঠিক ঠিক জানান। তাঁকে একদিন বলেছিলাম, ''এ - বিষয়ে লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট কী? নতুন কথা কে কী বলেছেন?'' তিনি বলেছিলেন এক সন্ন্যাসীর কথা।'

'কী কথা?' ওপর থেকে এবারে বিশুবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আরে, আপনি ঘুমোননি? আমাদের কথা শুনছেন?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তোমাদের কথা শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে।'

'সরি, অন্যায় হয়েছে।...'

'না না, কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি। তেমাদের কথা শুনতে বেশ লাগছে, বলে যাও। তা সেই সন্ন্যাসী কী কথা বলেছিলেন? বোঝা যাচ্ছে বিশুবাবুর প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে কথাটা জানার জন্য। স্পষ্ট করে শোনার জন্য নিজের অজান্তেই তিনি মাথা তুলে কানটা ওদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

'সে সন্ন্যাসী বলেছিলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, তার ধ্বংস নেই, ক্ষয় নেই।'

'এ তো পুরোনো কথা, হিন্দুদর্শনের কথা।' বিশুবাবু হতাশ গলায় বললেন।

'না, একেবারেই পুরোনো কতা নয়। তিনি বলেছিলেন আত্মার ধ্বংস যেমন নেই, পুনর্জন্মও নেই, সেই স্বর্গে বা নরকে যাবার ব্যাপারও।'

'গুরুতর ?' বিশুবাবুর গলায় উৎকণ্ঠা।

'হ্যাঁ, গুরুতর। আত্মা অনন্তকাল আত্মার মতোই থেকে যায়। তার কোনো রূপান্তর হয় না। থাকে আর কষ্ট পায়। পৃথিবীতে মানুষ যত রকমের অন্যায় - অপরাধ আর পাপ করে তার প্রতিটির জন্য প্রত্যেক আত্মাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। পালাবার বা বাঁচার কোনো উপায় নেই। তিল তিল করে প্রতিদিন প্রতি পল কষ্ট পেয়ে যেতে হয়। যারা পুণ্যবান, কোনো অন্যায় অপকর্ম করে না কেবল তারাই শান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।'

'কথাটা যে সত্য তা তিনি জানলেন কী করে?'

'আমিও এই প্রশ্নটা আমাদের কুলগুরুকে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ধ্যানের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সমাধিস্থ করে আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন খোঁজ নিতে। আত্মা ঘুরে আসার পর তিনি এই জ্ঞান লাভ করেন।'

'এরকম অভিজ্ঞতার পর তো তাঁর পাগল হয়ে যাওয়ার কথা।'

'ঠিকই ধরেছেন, তিনি তারপর পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সবাইকে তিনি তারপর থেকে সেই এক কথাই বলতে থাকতেন। তাঁর কথা শুনে লোকে হাসে। পাগল ভেবে তাড়া করে।'

'বুঝেছি, ঢের হয়েছে, যত্তসব আজগুবি কথা। চল, এবার ঘুমিয়ে পড়। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমারও ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ি।' বলে সব ঠিকঠাক করে ওরা দুজন যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল।

বিশুবাবু সন্ন্যাসীর কথা শুনে বাক্যহারা হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তার মাথায় গেঁথে গেল। এ - তো সাংঘাতিক কথা, আর অসম্ভবও নয়। এমনটা তো হতেই পারে। তার দৃঢ় বিশ্বাস আত্মা আছে এবং তা অমর। কিন্তু এই অমর আত্মা যদি কৃতকর্মের জন্য অনন্তকাল কষ্ট পায় তা হলে তো ভয়ানক কথা। অনন্তকাল কষ্ট পাওয়া মানে তো নরকযন্ত্রণা ভোগ করা। ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।

ছেলে দুটো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। তিনি তন্ময় হয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতে বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, কেবলই ভাবছিলেন, লক্ষ লক্ষ আত্মা মহাশূণ্যে ভাসছে, তারা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কাঁদছে। তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। ফিরে তাকাবার মতো কেউ কোথাও নেই। নিজের পাপের ভাগী তো নিজেকেই হতে হবে। কষ্ট নিজেকে পেতে হবে।

বিশুবাবুর কী দশা হবে? তিনি কি পুণ্যবান, নাকি পাপী? পুণ্যের কাজ তিনি অনেক করেছেন। দান - খয়রাতে তাঁর অনেক টাকা চলে গেছে। যখন যে যা চেয়েছেন দিয়েছেন, কাউকে কোনোদিন বিমুখ করেননি। তা হলে? তা হলে কেন তিনি মারা যাবার পর শাস্তি পাবেন? ... পরক্ষণেই আবার ভাবেন, না, তিনি শাস্তি পাবেন, কারণ তিনি অন্যায়ও কম করেননি।। ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি কত মিথ্যা কথা বলেছেন, কত লোককে ঠকিয়েছেন, পাওনাদারের কত টাকা মেরে দিয়েছেন, কত হিসেবের কারচুপি করেছেন। কর্মচারীদের প্রাপ্য টাকা দেননি অনেক সময়। তাদের কম মাইনে দিয়ে আধপেটা করে রেখেছেন দিনের পর দিন। কাজ হাসিল করার জন্য কতজনকে কত ঘুষ দিয়েছেন। কতজনের অন্যায় আবদার রেখেছেন। চড়া সুদে টাকা ধার দিয়েছেন। দিতে না - পারার জন্য কত জনের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। অনেক সময় মুনাফার স্বার্থে খাবারে ভেজাল দিয়েছেন। সত্যি, কী না করেছেন টাকা কামাইয়ের জন্য। শৈশবের তীব্র আর্থিক কষ্ট ভোলার জন্য তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিয়েছিলেন টাকা উপার্জন। সেই টাকা উপার্জন করতে করতে আজ এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন। এতদিন এসব নিয়ে ভাবেননি কোনো কথা। ভাবার প্রয়োজনও পড়েনি। আজ প্রথম এই ছেলেটির কথা শুনে তার মনে হাজার কথা উঁকি দিতে লাগল। কৃতকর্মের জন্য চিন্তা হতে লাগল। তাঁর কী হবে? খুব বেশি দিন হয়তো বাঁচবেন না। সেটা বড়ো কথা নয়। মারা যাবার পর কী হবে সেই চিন্তাটাই তাঁকে এখন খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

একটা কতা তিনি একমত যে এত অন্যায় করেছেন অথচ তার জন্য কোনো শাস্তি পাবেন না এ হতে পারে না। শাস্তি পেতেই হবে। এতদিন তাঁর মনে হয়েছিল সেই শাস্তি তিনি পাবেন স্বর্গে। সেখানে বিচার হবে। বিচার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ঘোষণা করবে। তিনি কিছুদিন শাস্তি ভোগ করার পর ফের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবেন। হয়তো স্বর্গেই বিচরণের সুযোগ পাবেন অথবা অন্য কোথাও। তিনি দান করেছেন। অনেকের উপকার করেছেন। মন্দিরে আর তীর্থস্থানে দু-হাতে টাকা ঢেলেছেন। সেসবের নিশ্চয় হিসেব হবে। তীর্থ করতে গিয়ে তিনি যেখানে যত সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, পুণ্যবান বলেছেন। বলেছেন, পরকালে তুই সুখেই থাকবি। তিনি বুঝতে পারছেন, পরকালে সুখে থাকা সহজ কথা নয়। এতদিন যে নিশ্চয়তা নিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে জীবনযাপন করছিলেন আজ তাতে চিড় ধরেছে। আগের যুক্তিগুলো আর এখন কাজ করছে না। বিশ্বাসের জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে গেছে।

ছেলেটি ঠিক কথাই বলেছে, মৃত্যুর পর কী হতে পারে এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। সব মতেরই বিশ্বাসী আছে। কেউ না কেউ কোনো না কোনো মত মানে। কিন্তু কোনটা সত্য বা মুশকিল। সেই সন্ন্যাসীর মতটা বিশুবাবুর খুব মনে ধরেছে। তাতে যুক্তি আছে যুক্তিগুলো তিনি নিজেই সাজিয়ে নিয়েছেন। পাপ করলে শাস্তি পেতেই হবে। আত্মা মরে না। সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে না। ফিরে যে আসে না একথা তিনি মানেন। তার কারণ এর কোনো প্রমাণ নেই। কোনো মানুষেরই আগের জন্মের কোনো স্মৃতি থাকে না। থাকে না যে কারণ এই আত্মাগুলো সব নতুন। ফিরে যখন আসে না তখন ধরে নিতে হবে যে আত্মাগুলো অনন্তকাল থাকে। থেকে কী করবে? মজা করে বেড়াবে? তা তো হতে পারে না। তা হলে? হয় পাপের জন্য শাস্তি পেতে হবে আর নয় তো পুণ্যের জন্য পুরস্কার পেতে হবে। পুরস্কার মানে সুখশান্তি নিয়ে অনন্তকাল স্বর্গে না - হোক মহাকাশে বিচরণ করা। কথাগুলো তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। আর এই বিশ্বাসযোগ্যতাই তাঁকে অশান্ত করে তুলছে। বার বার একটা কথাই বুকে ধাক্কা মারছে, তাঁর দশা কী হবে?

সাররাত ভদ্রলোক ঘুমোতে পারেননি। এরকম আগে কখনো হয়নি। জীবনে ট্রেনে - প্লেনে তো কম চড়েননি। কখনো তো এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। দিব্যি নাক ডেকে ঘুমিয়েছেন। আর আজ কিনা পরজন্মের কথা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে রাতের ঘুমটাই মাটি। সারারাত এপাশ - ওপাশ করে তিনি রাতটা পার করলেন। ভোর হতেই নেমে এলেন। প্রাতঃকৃত্য সারলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেলেন কিছুক্ষণ। তারপর জলের বোতল কিনে জল খেলেন। চা খেলেন। এভাবে কিছু সময় পার করার পর সবাই যখন ঘুম থেকে উঠে একে একে বার্থগুলো তুলে দিয়ে বসার জায়গা বের করে নিয়েছে, তখন তিনি গুটি গুটি পায়ে গিয়ে ছেলেদের পাশে বসলেন।

তিনি লক্ষ্য করলেন প্রত্যেকেরই প্রাতঃকৃত্য সারা হয়ে গেছে, হাত - মুখ মুছে চা নিয়ে বসেছে অসমিয়া পরিবারটা। ইমরান তার

ব্যাগ থেকে খাবার বের করল। সবাইকে দিল। বিশুবাবুকে সাধল। তিনি খাবেন না বললেন। শুধু চা খাবেন, যদিও ইতিমধ্যে এক কাপ খাওয়া হয়ে গেছে। ওরা খাবারটা শেষ করে চায়ের অর্ডার দিল। চাঅলা ওদের তিনজনকে চা দিল। ইমরান 'আরেক কাপ উনাকে দাও' বলায় সে আরেক কাপ চা বিশুবাবুকে দিল।

'রাত্রে তোমরা মৃত্যু - আত্মা - পরজন্ম ইত্যাদি নিয়ে বেশ জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলে।' চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন।

'ও কিছু না। টাইম পাস। ঘুম আসছিল না, কিছু করার ছিল না তাই কিছু একটা নিয়ে কথা বলে সময় কাঠানো আর কি।' অলক বিষয়টাকে তেমন আমল না - দিয়ে বলল। তারপর চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'বাজে চা।'

'আমার কাছে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল টপিকটা।' তারপর চায়ে আরেক চুমুক দিয়ে তিনি আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, সেই সন্ন্যাসী কোথায় থাকেন বলতে পার?'

'কোন সন্ন্যাসী?'

'সেই যে যিনি বলেছিলেন মৃত্যুর পর আত্মার কৃতকর্মের জন্য তিল তিল করে শাস্তি পায়...।'

'ও, সেই সন্ন্যাসী? তাঁকে চেনেন আমাদের কুলগুরু। তিনি বলেছিলেন সেই সন্ন্যাসী থাকেন বর্ধমানে।'

'বর্ধমান। যাক, তাঁর ঠিকানা একটা পাওয়া গেল।'

'কী ব্যাপার, আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান নাকি?'

'ভাবছি।'

'কেন? দেখা করে কী করবেন?'

'সে আমি বুঝব।' তিনি বললেন, 'তার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'মানে?' অলক খুব আশ্চর্য হল, 'আপনার কি কিছু জানার আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি জানতে চাই, মানুষের আত্মা যে মৃত্যুর পর অনন্তকাল তার কর্মের জন্য তিল তিল করে শাস্তি ভোগ করে তা থেকে মুক্তির উপায় কী?' তিনি আন্তরিকভাবে কথাটা বললেন কিন্তু অলকের মুখে মুচকি হাসি দেখে বুঝতে পারলেন, সে মজা পাচ্ছে এমন অদ্ভুত কৌতূহল দেখে।

'অসম্ভব কথা'। এবারে মুখ খুলল সমরেন্দ্র, 'কারও পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব নয়। তা হলে তো তাকে ভগবান হতে হবে। ভগবান ছাড়া কারও পক্ষে মুক্তির উপায় বাতলানো সম্ভব হবে না। যদি কেউ বাতলায়ও সে হবে ভাঁওতাবাজি।'

সমরেন্দ্রের কথা শুনে বিশুবাবুর রাগ হল খুব, সেদিনের পুঁচকে ছোঁড়া, তার মুখে কত বড়ো কথা! তুই ব্যাটা আধ্যাত্মিকতার জানিসটা কী?' তিনি মনে মনে বললেন, মুখে কিছু বললেন না। চুপ করে থেকে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর আপনমনে বললেন, 'ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হত তা হলে তো হয়েই ছিল। এত সোজা নয়।'

'ব্যাপারটা সোজা, একেবারেই সোজা।' এবারে অলক বলল, 'ভগবানকে ডেকে বা তাঁকে কোনো ধরণের ঘুষ দিয়ে, প্রার্থনা করে, উপোস করে নীতিনিয়ম মেনে ধার্মিক মহাপুরুষের উপদেশ মতো যা যা করার করেও আজ পর্যন্ত কেউ কি কোনো ধরনের ফল পেয়েছে? পায়নি, না - পাওয়ারই কথা। তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায় না, তিনি কারও কথা শোনেন না। ঠিক তেমনি মৃত্যুর পর কেউ নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে না সুখে থাকবে তা বলাও ধাপ্পাবাজি। এমন ধাপ্পাবাজিতে মুগ্ধ হয় সরলমতি আর ভীতু লোকেরা। এটাকে নির্বুদ্ধিতা বলাই ভালো।'

তিনি এসব ভাষণ শুনতে চান না। তাঁর দরকার সেই সন্ন্যাসীর ঠিকানা। রাগ চেপে তিনি বললেন, 'এসব বিশ্বাস - অবিশ্বাসের কথা, আমি সে বিতর্কে যেতে চাই না। আমার আগ্রহ হয়েছে। আমার বিশ্বাস আছে। আমার তাঁর ঠিকানাটা দরকার, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্নের উত্তরটা জেনে নেব। আমার স্থির বিশ্বাস তিনি জানেন। দেবে ভাই ঠিকানাটা?'

'সরি, ঠিকানা আমার জানা নেই, শুধু জানি তিনি বর্ধমান শহরে থাকেন।' অলক হতাশ করল।

'তাই নাকি?' তিনি বোধহয় কথাটা বিশ্বাস করলেন না, 'ঠিক আছে, হবে। আমি বর্ধমানে গিয়ে জেনে নিতে পারব। বর্ধমান এমন বড়ো জায়গা নয় সে সেই সন্ন্যাসীকে বার করা যাবে না। পারব, আমি ঠিক পারব।'

ইমরান খুব আলাপি ছেলে। ও এসবের ফাঁকে অসমিয়া পরিবারটির সঙ্গে আলাপ করে ফেলল। এঁরা গুয়াহাটিতে থাকেন, কলকাতায় যাচ্ছেন কাজে এবং বেড়াতে। ভদ্রলোক রাজ্য সরকারের চাকুরে। বেড়াতে ভালোবাসেন। সুযোগ পেলেই এদিক - ওদিক চলে যান। কলকাতা তাঁর খুব প্রিয় জায়গা। বছরে একবার অন্তত সেখানে যেতেই হয়। ছেলেমেয়েদেরও পছন্দের জায়গা কলকাতা। ইত্যাদি তথ্য সে জোগাড় করে নিয়েছে। নিজেদের তথ্যও দিয়েছে। ভদ্রলোক বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন আর বিশুবাবুর কথায় মনোযোগী হবার চেষ্টা করছিলেন। বোঝা যাচ্ছে বিষয়টার প্রতি ভদ্রলোকের আগ্রহ আছে। কিছু একটা বলার জন্য তিনি উসখুস করছেন।

বিশুবাবু হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন।

ইমরান খাবার বের করল। সমরেন্দ্র আর অলকও ওদের ব্যাগ থেকে একগাদা খাবার বের করল। অলকের সঙ্গে কাগজের প্লেট ছিল, সেগুলো বের করে খাবার সাজিয়ে ওদের দুজনকে দিয়ে নিজেরটা হাতে নিয়ে সেখান তেকে অসমিয়া ছেলেমেয়ে দুটিকে খানিকটা খাবার দিতে চাইল। এরা নিল না। অলকের মনে হল, বেশ ভালোভাবেই এদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কী মনে করে ইমরান অতিরিক্ত একটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে বিশুবাবুর দিকে এগিয়ে দিল। তিনি নির্দ্বিধায় তা নিলেন। এবং নিয়েই খাওয়া শুরু করলেন। বোঝা গেল তাঁর খুব খিদে পেয়েছে। সমরেন্দ্ররা বেশ অবাক হল।

অসমিয়া পরিবারটিও সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছিল। তারাও খাচ্ছে। ভদ্রমহিলা সৌজন্যবশত খাবারের খানিকটা ইমরানদেরও দিতে চাইলেন, ইমরান ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করল। টুকটাক কথা বলতে বলতে সবার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেল। অসমিয়া ভদ্রলোক কফিঅলাকে ডেকে সবাইকে কফি দিতে বললেন। কফির ভাগ বিশুবাবুও পেলেন। তিনি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'কলকাতা। আপনি?'

'বর্ধমান'। বিশুবাবু নির্বিকারভাবে বললেন। না, মিথ্যে কথা নয়, তিনি সত্যি সত্যি বর্ধমানে চলেছেন, কলকাতায় নয়। কলকাতায়

যাবেন বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই ছেলেদের কথা শুনে তিনি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বর্ধমানে নেমে যাবেন। সেখানে নেমে, যে করে হোক, সেই সন্ন্যাসীকে খুঁজতে হবে।

'আপনি তা হলে সত্যি সত্যি সেই সন্ন্যাসীকে খুঁজতে চললেন?' সমরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাস করল।

'ঠিক তা নয়। আমার কিছু কাজ আছে, কাজ সেরে সময় পেলে তাঁর খোঁজ, নেবার চেষ্টা করব, শুধু তাঁকে খোঁজার জন্যই সেখানে যাচ্ছি না।' কফিটা তেতো লাগছে খুব, আর খাওয়া যাচ্ছে না। কাপটা জানালা দিয়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, 'তাঁকে পাব কি না কে জানে। পেলে ভালো লাগবে, না - পেলে ক্ষতি নেই। তবে আত্মার রহস্যটা আমার জানা দরকার।'

'আত্মার রহস্য মানে?' অসমিয়া ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

'সে অনেক গূঢ় ব্যাপার। বর্ধমানের এক সন্ন্যাসী জানেন, তাঁর কাছে যেতে হবে।'

'গত বছর আমিও বর্ধমানে গিয়েছিলাম একটা কাজ নিয়ে। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি শুধু বলতেন, 'শান্তি নেই। মরেও শান্তি নেই। তোমার আত্মা তিল তিল করে শাস্তি পয়ে যাবে অনন্তকাল। মুক্তি নেই। যত ভোগ তত ভোগান্তি, যত পাপ তত শাপ।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো!' বিশুবাবুর চোখ কপালে ওঠার উপক্রম, 'আপনি তাঁকে নিজের চোখে দেখেছেন?'

'দেখেছি এবং কথাও বলেছি।'

'আপনার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল তাঁর?'

'আত্মার কথা।'

'আত্মার কথা?'

'হ্যাঁ, আত্মার কথা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি আত্মা দেখেছেন? তিনি বললেন, আত্মা কি দেখার জিনিসরে ভাই, আত্মা তো অনুভূতির ব্যাপার। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তা জানলেন কী করে? বললেন, ধ্যান করে। জানতে চাইলাম, মৃত্যুর পর আত্মার কী দশা হয়? বললেন, আত্মা অমর। সে বেঁচে থাকে এবং পাপের ফল ভোগ করে। কেউ পাপ করে না - থাকলে পুণ্যের ফল ভোগ করে।

'আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশাই। তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন না যারা পাপ করে তারাই সেই অনন্ত যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি কী করে পেতে পারে?

'আমার মাথায় আসেনি। তা ছাড়া, তিনি নিজে তখন হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাঁকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমি আর সেখানে দাঁড়াইনি, চলে আসি হোটেলে।'

'মিস করলেন, খুব মিস করলেন, এত বড়ো সুযোগ পেয়েও আপনি তার সদব্যবহার করলেন না।' বিশুবাবু হতাশ গলায় বললেন। তারপর চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন। ভেবে বলেলেন, 'আচ্ছা, এখন গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে?'

'সে আমি বলতে পারব না।'

'তিনি বর্ধমানে কোথায় থাকেন?'

'তা-ও বলতে পারব না। সেই সন্ন্যাসীর স্থায়ী কোনো ঠিকানা ছিল না। ঘুরে বেড়াতেন, যেখানে সেখানে আখড়া বসাতেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাজারে, এক কাপড়ের দোকানে।'

এরপর আত্মা - পরমাত্মা, এ - জন্ম - পরজন্ম, পাপ - পুণ্য ইত্যাদি নিয়ে রীতিমত আড্ডা জমে উঠল। সময় কী করে বয়ে চলেছিল তা কেউই টের পাচ্ছিল না। হঠাৎ বোলপুর স্টেশন আসতে সবাই ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ইমরান, সমরেন্দ্র আর অলক নেমে যাবে। ওদের বিদায় দিতে কারও ভালো লাগছিল না, তবু উপায় তো নেই, বিদায় দিতেই হবে। ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় অলক বিশুবাবুকে বলল, 'বর্ধমানে আপনার সঙ্গে সেই সন্ন্যাসীর দেখা হোক এই কামনা করি। আবার নিশ্চয় আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, তখন জেনে নেব আত্মাকে অনন্ত কষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর উপায়।'

বিশুবাবু কিছু বললেন না। হাসলেন শুধু। বুঝলেন, বিদ্রূপ করছে। করুক।

দুই

বিশুবাবু পাঁচদিন ছিলেন বর্ধমানে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সেই সন্ন্যাসীর ঠিকানা। কেউ দিতে পারল না। তবে কেউ অস্বীকারও করল না তাঁর অস্তিত্বের কথা। কেউ বলল, 'ওখানে যান।' কেউ বলল, 'অমুকের সঙ্গে দেখা করুন।' আবার কেউ জানাল, 'অনেক দিন হল তিনি এ - জায়গা ছেড়ে চলে গেছেন, এখন তাঁর হদিস পাওয়া শক্ত।' শেষ পর্যন্ত একজনের কাছ থেকে একটা পাকা খবর পাওয়া গেল। তিনি এক হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার। তিনি জানালেন, 'আমি যদ্দূর জানি, তিনি এখন কাশীতে আছেন, কাশীতে গেলে আপনি তাঁকে পেয়ে যাবেন। আপনি এখন সোজা কাশী চলে যান।'

বিশুবাবু তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন কাশী অভিমুখে। এ- ক-দিন তাঁর মুখে জমেছে দাড়ি। চুল উসকো - কুসকো। শরীর অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অসুস্থ স্ত্রীর কথা তার মনে পড়ছে না, একবারও ভাবছেন না মেয়ের কথা, মেয়ের বিয়ের কথা। ভুলে বসে আছেন সেই বিশাল ব্যাবসার কথা। ঘরসংসার, টাকাপয়সা, লোকজন, কাজকর্ম ইত্যাদি কোনো কিছুই এখন আর তাঁকে টানছে না। তাঁকে টানছে শুধু সেই সন্ন্যাসী। কারণ একমাত্র তিনিই জানেন মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত কষ্টের হাত থেকে বাঁচার উপায়। সেই উপায় না - জানা পর্যন্ত সংসারের সব অর্থহীন। দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার? তিনি এত অন্যায়, এত পাপ কার জন্য করেছেন? স্ত্রী আর কন্যার জন্য। এখন জুটবে জামাই। এরা আমার উপার্জনের সমস্তটা পাবে, পেয়ে মৌজ করবে, মস্তি করবে, ইচ্ছে হলে ওড়াবে। অথচ তিনি মারা যাবার পর সেই উপার্জনের পেছনে যে পাপ আর অপকর্ম তার জন্য কষ্ট পাবেন, নরকযন্ত্রণা ভোগ করবেন তিনি একা। তা-ও একদিন - দুদিন নয়, অনন্তকাল। তখন তো বউ মেয়ে জামাই কেউ থাকবে না সঙ্গে। তা হলে কার জন্য বাঁচা, কার জন্য মরা? শয়নে স্বপনে বিশুবাবুর মনে কেবল একটাই চিন্তা ঝড় তোলে। সেই ঝড়ে তিনি বিধ্বস্ত। তাঁকে হয় পরকালের কষ্ট থেকে মুক্তির উপায় জানতে হবে আর নয় তো না - মরে বেঁচে থাকতে হবে।

কাশীতে গিয়ে বিশুবাবু একমাস থেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সেই সন্ন্যাসীকে। পেলেন না। একমাস ধরে একটা লোককে খুঁজে

বেড়ানো কম কথা নয়। বিশুবাবু তবু ভেঙে পড়লেন না। তিনি জানেন ভেঙে পড়লে চলবে না। যদিও শরীর ভেঙে পড়েছে। রোগা হয়ে গেছেন খুব। গায়ের রং হয়েছে কালো। চুল - দাড়ি হয়েছে বেশ লম্বা। চেনাই যায় না। বাড়ির লোকেও চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বিশুবাবু এ নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন। তিনি চিন্তিত তাঁর আত্মা নিয়ে। তাঁর শরীর কষ্ট পাক, আত্মা কেন কষ্ট পাবে? সেটাই তো পাপ। তিনি এতদিন সেই পাপই করে এসেছেন। বুঝতে পারেননি আগে, এখন বুঝতে পারছেন। তাই এত চিন্তা, তাই এত ছুটে বেড়ানো সেই সন্যাসীর জন্য। তিনি জানেন, তাঁর কাছ থেকে জানতে হবে মুক্তির উপায়।

প্রায় একবছর বিশুবাবু ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন। খুঁজে বেড়ালেন সেই সন্ন্যাসীকে। যেখানেই যান লোকে বলে, তিনি এখানে ছিলেন বটে, তবে এখন নেই, তিনি তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন, কখন কোথায় থাকেন কেউ জানেন না। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। কারণ তিনি জানেন হাল ছাড়লেই বিপদ। তাই মনকে বলেন, চলো, খুঁজে বেড়াই তাঁকে।

এদিকে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন শোকে। স্বাভাবিক, অকস্মাৎ বিনা কারণে সুস্থ - সমর্থ এক স্বামীর 'নেই' হয়ে যাওয়ার শোক সামলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। মেয়ে বাড়িতে একাকী। বিয়ে ভেঙে গেছে। যাবতীয় ব্যবসা ডকে উঠেছে। যে যেদিকে পারে লুটেপুটে খাচ্ছে। কেউ দেখবার নেই, কেউ বলার নেই। আত্মীয়রা মজা দেখছে। বিপদে যারা বন্ধু হবার কথা তারা হয়ে উঠেছে সুযোগসন্ধানী। পুলিশ খুঁজছে তাঁকে, কিন্তু কোনো হদিস দিতে পারছে না। বার বার বলছে, 'দেখছি, যা করার করছি।' খোঁজ নিতে গেলেই ওরা টাকা চায়।

শেষ পর্যন্ত বিশুবাবুর খোঁজ পাওয়া গেল গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে। অম্বুবাচির মেলায়। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেরুয়া পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। যাকে সামনে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন, 'অনন্ত কষ্টের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? পারবে মৃত্যুকে ঠকাতে?' বলেই হাঃ হাঃ করে হাসেন। তারপর চিৎকার করে কাঁদেন, 'হায়, আমার কী হবে?' সে এক আজব দৃশ্য। লোকে হাসে তাঁর কাণ্ড দেখে। প্রহরারত পুলিশদের কেমন যেন সন্দেহ হয়। তারা তাঁকে ধরে নিয়ে যায় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের ধারণা হয়। এ-ই সে। মেয়েকে খবর দেওয়া হয়। মেয়ে দৌড়ে আসে। সে চিনতে পারেনি প্রথমটায়, পরে বুঝতে পারে, ইনি তার পিতা।

বিশুবাবুকে ডাউনটাউন হাসপাতালে ভর্তি করানো হল।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর ডাক্তাররা বুঝতে পারেন, তিনি মানসিক বিকারগ্রস্ত।

'ডাক্তারবাবু, রোগটা কী?' হারানো বাবাকে ফিরে পেয়েও আবার হারানোর ভয়ে ম্রিয়মান মেয়ে প্রশ্ন করে।

'রোগটা মনের।'

'সারবে তো?' মেয়ের গলায় আতঙ্কের স্বর, 'আর আমার মধ্যেও তা ছড়াবে না তো?'

'ভয় নেই, সারবে।' ডাক্তার জানালেন, 'তবে রোগটা আপনার মধ্যে ছড়াবে কি না তা আপনিই বলতে পারবেন।'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ। আপনি যদি আশাবাদী হন, নিজেকে শক্ত করে রাখতে পারেন, এই পরিস্থিতিতে মনের জোর বাড়াতে পারেন, তা হলে এ রোগ ছড়াবে না। আসলে এই রোগ একজনেরই হয়, ছড়ায় না, ছড়ালে পৃথিবীটা একটা পাগলাগারদ হয়ে যেত।'

বিশুবাবুর চিকিৎসা চলছে। মেয়ে তার মনের জোর বাড়িয়ে চলেছে। তার মধ্যেও বাবার এই অদ্ভুত রোগটা ছড়াতে পারে, সেই ভয়ে সে অনবরত তার মনের জোর বাড়িয়ে চলেছে। সে এখন খুব আশাবাদী।